এইসময়
সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

নতুন সৃষ্টি মানে মনের মধ্যে নতুন প্রতিমা গড়া। যে চরিত্র অভিনয় করছি তার নূতন বাঁক, নূতন গলি, নূতন চৌরাস্তা আবিষ্কার।

— উৎপল দত্ত

সংরক্ষণ

সম্প্রতি কর্নাটক সরকার সংরক্ষণ নীতিতে ব্যাপক রদবদলের প্রস্তাব পেশ করেছে। রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী দুই গোষ্ঠী, ভোক্কালিগা এবং লিঙ্গায়তদের জন্য ধার্য ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে, এবং তার দরুণ অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে মুসলমান সম্প্রদায়। এ ছাড়াও তফশিলি জাতিকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আরও চারটি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে, এবং সে ক্ষেত্রেও সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। আইনত যদিও এটি চূড়ান্ত নয়। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্রকে অনুরোধ করা হবে এটি সংবিধানের নবম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির জন্য, যাতে আদালত এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করতে পারে। অনুমান স্বাভাবিক যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেই এই রদবদলের ভাবনা। তবে কর্নাটক শুধু একাই নয়, একাধিক রাজ্য সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি বা তার বিন্যাস পরিবর্তনের পথে হাঁটছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই নাকচ করছে শীর্ষ আদালত। ২০২১ সালে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভান্নিয়াকুল্লা ক্ষত্রিয়দের জন্য আলাদা সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হয়, যা এক বছর পর নাকচ করে দেয় শীর্ষ আদালত। একই ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী মারাঠাদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, যা বাতিল হয়ে গিয়েছে শীর্ষ আদালতে। সরকারের দাবি ছিল, কৃষিক্ষেত্রে দুরবস্থার জন্যই এই প্রস্তাব।

কৃষিক্ষেত্রে দুরবস্থা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, ভ্রান্তি তার নিরাময়ের পথ নির্বাচনে। মূল সমস্যাটি হল, কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত যে শ্রমিক, তাদের জন্য অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিয়মিত উপার্জনের ব্যবস্থা করা যায়নি। বরং ঘটেছে তার বিপরীত। অতিমারীর সময় এবং তার পরও, অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত বহু মানুষ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়েছে। অতিমারী-পূর্ব শেষ আর্থিক বছর, অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯-এর পরিসংখ্যানের সঙ্গে ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের পরিসংখ্যান তুলনা করলে সে চিত্রটিই পরিস্ফুট হয়। এটিও মনে রাখা দরকার যে যেটুকু অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয়েছে, তা-ও মূলত স্বনিযুক্তির মাধ্যমে। অর্থাৎ, কৃষির কোনও বিকল্প জীবিকা গড়ে তুলতে ব্যর্থ এ দেশের নীতি-নির্ধারকগণ। যখন নতুন কর্মসংস্থানই হচ্ছে না, তখন শুধুমাত্র সংরক্ষণ নীতি নানা ভাবে বদলে নাগরিকদের তুষ্ট করার প্রয়াস বৃথা ও অকার্যকরী হতে বাধ্য। প্রয়োজন ব্যাধির কারণটি চিহ্নিত করা, স্রেফ উপসর্গের দিকে নজর দিলে মূল অসুখটি সারবে না।

লোভ

মানুষের জীবনে খেলনার গুরুত্ব ঠিক কতখানি তা তলিয়ে দেখার এটিই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময়। সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত বন্দুক, গোলাগুলির বিধ্বংসী ক্ষমতার প্রদর্শন নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখলে বিবর্তনের কালে শরীরের সঙ্গে মস্তিষ্কেরও পরিবর্তন ঘটেছে ইত্যাদি প্রত্যয় সংশয়দীর্ণ হতে বাধ্য। পশ্চিম এশিয়ার মরুশহরগুলির ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বহুমূল্য গাড়ির সঙ্গে দেশ-বিদেশ থেকে বিলুপ্তপ্রায় জিনিস সংগ্রহ করে থাকে। কতিপয় নাৎসি মানুষের চামড়ায় বাঁধানো বই এবং বাতিদানের ঢাকনা জমাত। ‘হটেনটট ভেনাসকে’ খেলনা হিসেবেই শ্বেতাঙ্গরা ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল, চিড়িয়াখানাতেও রেখেছিল কৃষ্ণাঙ্গদের এক সময়ে। সাধারণ মানুষও এ ধরনের বিলাস ব্যসনে মুগ্ধ, এবং অবলা প্রাণীর ন্যায় সরল অনুকরণে ব্যস্ত। অনেক সংস্থাই সেটিকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করেছে। অতএব, বেঙ্গালুরুর এক মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী একজন সাধারণ ডেলিভারি বয়ের হাতে দামি মোবাইল ফোন দেখে তাঁকে খুন করে সেটি হস্তগত করেন। ডেলিভারি বয় এবং মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী, দু’জনেই বিপণনের ঝলমলানো চোরাবালিতে ডুবেছিলেন। মুশকিল হল, এর উল্টো দিকে অন্য কোনও জীবনের খোঁজ পড়লে হিমালয়ে সন্ন্যাসজীবন বেছে নেওয়ার পথ দেখানো হয়েছে। ‘নির্লোভ’ শব্দটি কি সত্যিই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল এই সভ্যতায়?

অসংখ্যা

১২৮২০০০০

(এক কোটি আঠাশ লক্ষ কুড়ি হাজার) মেট্রিক টন— ২০২০-তে ভারতে এলপিজি উৎপাদনের পরিমাণ। সূত্র: স্ট্যাটিস্টা

দিনকেদিন

২৯ মার্চ

১৯২৯: উৎপল দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘টিনের তলোয়ার’, ‘অঙ্গার’, ‘কল্লোল’ ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি বহু হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

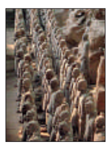

১৯৭৪: ২১০-২০৯ খ্রিস্টপূর্বে নির্মিত চিন সম্রাট কিন শি হুয়াং-এর সমাধিস্থল ও টেরাকোটা আর্মি আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন চৈনিক মৃৎশিল্পের সবচেয়ে বড় নিদর্শন।

সাফল্য

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

বোধিবৃক্ষ

পার্বতী একদিন ভগবান সদাশিবকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘জীবনের সফলতা লাভের রহস্য কী?’ শিব উত্তরে বললেন, ‘সফলতা লাভের সাতটি উপায় আছে।’ তিনি বললেন, ‘প্রথম উপায়টি হচ্ছে ‘আমি আমার ব্রতে সফলীভূত হবোই হবো’— এই দৃঢ় প্রত্যয় সাধকের মধ্যে থাকলেই হবে। এটাই হচ্ছে সফলতা লাভের প্রথম তত্ত্ব। একজন মানুষ কিছু একটা করছে, কিন্তু তার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস নেই— বরং তার মনে প্রশ্ন, ‘আমি কি সফল হবো? যদি আমি সফল না হই’— এই সব। তাহলে সে কখনই সফল হবে না। তাই ‘আমি সফল হবই’ এটি হচ্ছে প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব।

দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে, নিজের লক্ষ্যের প্রতি, আদর্শের প্রতি বিশ্বাস থাকতেই হবে। তৃতীয় হচ্ছে, গুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকতে হবে। পঞ্চম হচ্ছে আত্মসংযম থাকতে হবে। অনেক খেলুম, ঘুমোলুম, পান করলুম, এইসব দুর্বলতা সাধককে মোটেই সাহায্য করে না। জীবনে অবশ্যই একটা সন্তুলন থাকতে হবে, আত্মসংযম থাকতে হবে। আর ষষ্ঠ, একজনকে সন্তুলিত আহার করতে হবে— খুব বেশীও নয়, খুব কমও নয়। তা যথেষ্ট হতে হবে, সাত্ত্বিক হতে হবে, অথবী গৃহীদের ক্ষেত্রে রাজসিক হতে হবে। অবশ্যই তামসিক নয়, কেননা তুমি যা খাও তা তোমার দেহের কোষকে তৈরী করে আর তোমার মন, দেহের সমস্ত কোষের মনের সমাহারে তৈরি এক সামবায়িক মন। (‘আনন্দ বচনামৃতম্’ থেকে গৃহীত)

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক সমীক্ষাই বলছে, গ্রামে তিন-চতুর্থাংশ পরিবারের রান্না হচ্ছে কাঠকুটোতে

উজ্জ্বল ‘উজ্জ্বলা’ এতটা ম্লান হয়ে গেল কেন?

রান্নার গ্যাসের দাম বিপুল হারে বেড়েছে। আর্থিক দুর্গতি বেড়েছে নোটবন্দি ও করোনার দরুণ। ফলে দরিদ্র পরিবারের পক্ষে সিলিন্ডার রিফিল করানো অসম্ভব। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

মৃণাল সেন পরিচালিত ‘চালচিত্র’ চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

গ্রামের চারটিতে তিনটি পরিবার নাকি এখন কাঠকুটোতে রান্না করছে, বলছে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক সমীক্ষা। এই কেন্দ্রীয় সরকারই তো আবার উজ্জ্বলা যোজনা শুরুর সময়ে বলেছে, ২০১৬ সালে ৬৪% পরিবারে এলপিজি গ্যাস সংযোগ আছে যা ২০২১ সালে পৌঁছেছে ৯৯.৮ শতাংশে। তা হলে এই কাঠকুটোয় রান্না করা পরিবারগুলি কোথায় ছিল? সে সব পরিবারই তো উজ্জ্বলা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। সেই মেয়েরা কি গ্যাস পায়নি? না, ব্যবহার করছে না? তা হলে মেয়েদের স্বাস্থ্য, সময়, অবসর এ সবে আবার হাত পড়ল?

রান্নাঘরের দূষণ

গ্রামের রান্নাঘর মানেই বেশির ভাগ সময়ে একটা ছোট্ট ঝুপড়ি, নিচু চাল, কোনও জানালা নেই, ধোঁয়া বেরোনোর কোনও ব্যবস্থা নেই, ধোঁয়া আর ঝুলে এতই অন্ধকার যে দিনের বেলাতেও কিছু দেখতে গেলে বেশ ঠাহর করে দেখতে হয়। কারণ গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িতেই জ্বালানি মানে কাঠকুটো, পাতাপুতি, গরুছাগল থাকলে গোবর পাওয়া গেলে হয়তো ঘুঁটে। তাই রান্নাঘর হয় বাড়ির থেকে আলাদা, যাতে বাকি বাড়িটা ওই ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার না হয়ে যায়। কিন্তু রান্নার দায়িত্বও থাকে মেয়েদের উপরে, আর মেয়েদের সঙ্গে বাচ্চারাও মা-কাকিমা-ঠাকুমার কাছাকাছি থাকে অনেক সময়ে, বাচ্চাদের উপরে মেয়েদের নজরদারির সুবিধাও হয়। কিন্তু এই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন অন্ধকার রান্নাঘরে মেয়েদের নিঃশ্বাসের সমস্যা থেকে হাঁপানি, চোখের সমস্যা থেকে জীবনীশক্তি কমে যাওয়া, সব কিছুই ঘটে। যে বাচ্চারা রান্নাঘরের আশপাশে একটা বড়ো সময় কাটায়, তারাও একই ভাবে স্বাস্থ্যহানির কবলে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ধরনের রান্নাঘর বছরে পাঁচ লক্ষ মেয়ের মৃত্যুর কারণ বলে জানিয়েছে। আবার এ কথাও সমীক্ষা বলছে যে, এ রকম খোলা আগুনের সামনে রান্না করা মানে দিনে চারশোটি সিগারেটের ধোঁয়া শ্বাসনালীতে যাওয়ার সমান। সুস্বাস্থ্যের অধিকার তো অন্যতম মৌলিক অধিকার। তাই রান্নাঘরে জৈব গ্যাস, বিদ্যুৎ, এলপিজি গ্যাস, এ সব উন্নত জ্বালানির ব্যবস্থা মেয়েদের স্বাস্থ্য যেমন ভাল করে, তেমনই কাঠকুটো, শুকনো ডালপালা, গোবর কুড়োনো, যেটা মেয়েদেরই কাজ, সেটা সময়ও কমাতে পারে। আর জ্বালানি সংগ্রহের জন্যে দিনে দিনে মেয়েদের আরও বেশি বেশি করে সময় দিতে হচ্ছে, আরও বেশি পথ হাঁটতে হচ্ছে, কারণ গ্রামের দিকেও গাছপালা কমছে, গোবর কম পাওয়া যায়। এ তো গত শতকের আটের দশকেই বলেছেন অর্থনীতিবিদ বীণা আগরওয়াল। ফলে বাড়ছে মেয়েদের কাজের সময়, কমছে অবসর।

অসাম্যের খতিয়ান

পরিবার দূষণহীন জ্বালানি ব্যবহার করবে কি না, পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর্থিক সঙ্গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিবার দূষণযুক্ত জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে ক্রমশ দূষণহীন জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়। তার মধ্যে হয়তো উদ্দেশ্য অনুযায়ী জ্বালানির তারতম্য ঘটে। যেমন রান্না হচ্ছে এলপিজিতে, বাচ্চার দুধ ফোটানো হচ্ছে কেরোসিন স্টোভে, আবার জল গরম হচ্ছে বাইরে শুকনো ডালপালায় বানানো ইটের অস্থায়ী উনুনে। অবশ্য ২০২০ সালের তথ্য বলছে, গ্রামের ২০% পরিবার এখনও পুরোপুরি কাঠকুটো, গোবর এ সবের উপর নির্ভর করে। তবে শুধু অর্থ নয়, পরিবারের লোকজনের শিক্ষার স্তর, বাড়িতে লোকসংখ্যা কত, এটাও জ্বালানি ব্যবহারের সিদ্ধান্তে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পরিবারের কর্তা আর মেয়েদের শিক্ষা সরাসরি পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়, সাধারণত একটি বাড়লে অন্যটিও বাড়ে। আবার পরিবারে যদি মেয়েদের সংখ্যা বেশি হয়, শিক্ষার মান তেমন না হয়, তা হলে ঘুরে ঘুরে জ্বালানি সংগ্রহের উপর নির্ভরতা বাড়ে। তাই ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যের বিশ্লেষণ দেখিয়েছে গ্রামীণ দরিদ্রতম পরিবারগুলির দূষণযুক্ত জ্বালানির উপরে নির্ভরতা যে হারে কমেছে (৬০% থেকে ৩৫%), ধনীতম পরিবারগুলিতে দূষণহীন জ্বালানি ব্যবহার তার থেকে অনেক বেশি হারে বেড়েছে (২০% থেকে ৬০%)।

‘উজ্জ্বল’ উজ্জ্বলা

উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায় ২০১৬ সালের ১ মে শুরু হল উজ্জ্বলা যোজনা, লক্ষ্য দারিদ্রসীমার নীচে থাকা আট কোটি পরিবারের মেয়েদের ২০২০ সালের মধ্যেই বিনামূল্যে গ্যাস দেওয়া, প্রাথমিক ডিপোজিটের টাকা তাদের দিতে হবে না আর গ্যাসের উনুনটিও তারা বিনামূল্যে পাবে। এই লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পূরণ হয়ে গেল। তাই ২০১১ সালে যেখানে সারা দেশে ৩০% পরিবার এলপিজি গ্যাসে রান্না করতেন, যার মধ্যে ১০% পরিবার হল গ্রামীণ পরিবার, ২০২০ সালে দেখা গেল ৭০% পরিবার রান্নার কাজটা মূলত গ্যাসে সারছেন, আর তার মধ্যে ৬০% গ্রামীণ পরিবার আর ৯৫% শহরাঞ্চলের পরিবার। অপরিষ্কার জ্বালানি থেকে পরিষ্কার জ্বালানিতে উত্তরণের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ বলে এই যোজনাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হল। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এ নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রচার করল। কোভিডের সময়ে রুজি-রোজগারে টান পড়ায় ২০২০-২১ সালে দারিদ্রসীমার নিচের পরিবারগুলিকে আরও তিনটি গ্যাসের সিলিন্ডার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এই প্রকল্পের পর এল উজ্জ্বলা-২, ঘোষণা করা হল আরও এক কোটি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন অন্ধকার রান্নাঘরে মেয়েদের নিঃশ্বাসের সমস্যা থেকে হাঁপানি, চোখের সমস্যা থেকে জীবনীশক্তি কমে যাওয়া, সব কিছুই ঘটে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ধরনের রান্নাঘর বছরে পাঁচ লক্ষ মেয়ের মৃত্যুর কারণ বলে জানিয়েছে।

সিলিন্ডার রিফিল

উজ্জ্বলা নিয়ে প্রধান বিতর্ক যে দরিদ্র পরিবারগুলি গ্যাস সংযোগ করলেও রিফিল ভরাচ্ছে না নানা কারণে। তখন ধর্মেন্দ্র প্রধান খনিজ তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী। কেরালার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাংসদ এমকে রাঘবন রিফিল ভরার বিষয়টি নিয়ে যখন লোকসভায় ২০২০ সালে প্রশ্ন করেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন দরিদ্র পরিবারগুলি বছরে ৩.১টি রিফিল ভর্তি করেছে। এই তথ্য নিয়েই সংশয়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞরা বলছেন, এই তথ্য উপভোক্তা বা বেনিফিশিয়ারিদের তরফে আসেনি, এসেছে তেল বাজারজাত করার কোম্পানিগুলির তরফে, যাদের উপরে এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব ছিল। একটি আরটিআইয়ের জবাবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন জানিয়েছে, ২০২১ মার্চ মাস পর্যন্ত ৬৫ লক্ষ উপভোক্তা গত বছরে পাওয়া গ্যাস সংযোগ রিফিল করেনি, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড-এর যথাক্রমে ৯.১ লক্ষ ও ১৫.৯৬ লক্ষ রিফিল করেননি। অর্থাৎ গত আর্থিক বছরে ৯০ লক্ষ উপভোক্তা এক বারও সিলিন্ডার ভর্তি করায়নি আর এক কোটি করেছে মাত্র এক বার। তা হলে ওই বছরে অন্তত তিনটি সিলিন্ডার ভরানোর তথ্য কেন বার বার উচ্চারিত হচ্ছে? সেটি তো করোনা কালে বাড়তি তিনটি সিলিন্ডার বিনামূল্যে পাওয়ার জন্যে সম্ভব হয়েছে। আরটিআই করে জানা গেছে ২০২১-’২২ সালে সাড়ে ন’কোটি উজ্জ্বলা গ্রাহক ৩.৫টি সিলিন্ডার রিফিল করেছেন, যেখানে ২১.৫ কোটি সাধারণ গ্রাহক সাতটি রিফিল করেছে। হিসেব বলে গড়ে চারজন সদস্যের পরিবারে সব রান্না গ্যাসে হলে তাঁদের সাত থেকে আটটি সিলিন্ডার লাগার কথা। তার মানে উজ্জ্বলা গ্রাহকরা সব রান্না গ্যাসে করছেন না। এই তথ্যের সমর্থন পঞ্চম জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (২০২০-২১) থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। গ্যাসের দাম এত বেড়েছে যে, তাদের পক্ষে রিফিল করা সম্ভব হচ্ছে না বলে তারা আবার দূষিত জ্বালানিতে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে। তাই কী ভাবে সিলিন্ডারের দাম কমানো যায়, ভর্তুকি বাড়ানো যায় এবং উজ্জ্বলা গ্রাহকের কাছে তা অবিলম্বে বা এমনকী অগ্রিম পৌঁছনো যায়, সেটার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্রসীমার নীচে পরিবারদের নির্ভরযোগ্য সংখ্যা কী করে পাওয়া যায় এবং সময়ে সময়ে সেই তালিকা কী করে ঝাড়াই বাছাই করা যায়, সেটাও দেখতে হবে।

ভর্তুকির পাটিগণিত

দেশে ৩০ কোটি গ্যাসের গ্রাহক, তার মধ্যে ভর্তুকি ছেড়েছেন মাত্র সোয়া কোটি মত গ্রাহক আর উজ্জ্বলার গ্রাহক ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত হয়েছে ৯.৫ কোটি। বলা হয়েছিল এই যারা ভর্তুকি ছাড়ল, তাদের টাকা দিয়েই দরিদ্রতম পরিবারগুলিকে সর্বাধিক ভর্তুকি দেওয়া হবে। বাস্তবে তা হল কই? গ্যাস সংযোগ নিয়ে ঝাড়াই বাছাই, আধারের সঙ্গে যুক্ত করা, সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ভর্তুকি, এ সবের ফলে সরকারের ভর্তুকি দেওয়ার পরিমাণ অনেক কমে আসার কথা। বলা হল, উজ্জ্বলা যোজনায় বারোটি রিফিল পর্যন্ত ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে রিফিল পিছু আরও ২০০ টাকা করে ভর্তুকি আসবে, কিন্তু আগে কিনতে হবে, তার পরে ভর্তুকি। গত চার বছরে গ্যাসের দাম ৭০০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১১০০ টাকা। এটাই হয়েছে রিফিলের মূল সমস্যা। অনেক পরিবারে আর্থিক সিদ্ধান্ত পুরুষটি নেয়, যেমন জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা বলেছে ২০২০-২১ সালেও মাত্র ১৪% মহিলা বাড়িতে কী জ্বালানি ব্যবহার হবে, তাই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নোটবন্দি আর করোনাকালের আর্থিক দুর্গতি এখনও বহু পরিবার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যদি সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে কমিশনের ১০ লক্ষ কোটি টাকা বাজেটে রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে উজ্জ্বলা গ্রাহকদের ভর্তুকি কেন বাড়ানো যাবে না?

দরিদ্র পরিবারের গ্যাসের দাম হয় কমানো হোক, নয় ভর্তুকি বাড়ানো হক, তবে উজ্জ্বলা মেয়েদের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে, কারণ রান্নাঘরের বোঝা তাদের অদূর ভবিষ্যতে কমবে, এমন আশা কম।

লেখক সমাজকর্মী ও অর্থনীতির শিক্ষক

‘কাদা পায়ে থিয়েটারে এসো না’

সদ্য পেরোল বিশ্ব নাট্য দিবস। এ বছর বার্তা পাঠিয়েছেন মিশরের অভিনেত্রী সামিহা আইয়ুব। তাঁকে এবং তাঁর বক্তব্য নিয়ে কিছু কথা। লিখছেন **চন্দন সেন**

মাত্র ক’দিন আগেই এক মজামেশানো করুণ অভিজ্ঞতা হল। ভিন রাজ্যে এক নাট্যরচনা বিষয়ক আলোচনা শেষ হয়েছে, হল থেকে বেরোনোর মুখে এক সপ্রতিভ ভিন্নভাষী প্রৌঢ়ের বিরতিহীন ইংরেজি প্রশ্নবাণ!

‘আচ্ছা বলতে পারেন, এ বার বিশ্ব নাট্য দিবসের বাণী দেওয়ার জন্য ইউনেস্কো বা আইটিআই আর কাউকে পেল না? শেষ পর্যন্ত সব বাদ দিয়ে মিশর থেকে এক মামুলি অভিনেত্রী! খোঁজ নিয়ে জানলাম, তার তিন-তিনবার শাদি হয়ে গেছে! ওখানে নাকি অনেকগুলো নাটকে অভিনয় করেছে, টিভি সিরিয়ালে করেছে, কয়েকটা ফিল্মেও করেছে, যার মধ্যে একটার নাম ‘দ্য ডন অব ইসলাম’! ভাবা যায়? একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বনাট্য দিবসের বাণীদাতার সম্মান প্রদর্শনের নামে আর কত নীচে নামবে? আমাদের মীনা কুমারী, মধুবালাও তো নামি অভিনেত্রী ছিল, একাধিক শাদির রেকর্ডও আছে, ওদের কাউকে তো ইউনেস্কো বাণী দিতে ডাকেনি! তখন অবশ্য টিভি ছিল না তবে ফিল্ম তো ওরা চুটিয়ে করেছে, যদিও ‘ইসলাম’ নাম দেওয়া কোন ফিল্ম ওরা করেনি।’

ভেতরের অজ্ঞতা ঢাকতে বাইরে ভার্চুয়াল পাণ্ডিত্য ফলানো সুলভ সবজান্তাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য আর পরোক্ষ প্ররোচনা বয়সের জন্যই এখন এড়িয়ে চলি। চরম বিরক্তিতে এই পণ্ডিতের বাকি ভাষণ না শুনেই বাইরে বেরোতেই এত ক্ষণের নীরব মলিন মুখে হাসি ফুটল। মাস দেড়েক আগে দিল্লির এক বঙ্গনাট্যের উৎসবে ঝড় তোলা, দিল্লিতেই নাট্যচর্চারত যে উত্তর-তরুণ নাট্যপ্রতিভা স্ট্রিন্ডবার্গের ‘ফাদার’ নাটকটির অসাধারণ বঙ্গীকরণ করে প্রযোজনা করেছেন, তিনি আমার সামনে। সঙ্গে গভীর দুই জিজ্ঞাসা: সামিহা আয়ুবের কোন নাটক বা ফিল্ম ভার্চুয়ালি দেখেছি কি না (তিনি দেখেছেন)! এবং এত দেরিতে এই ৯১ বছর বয়সে আইটিআই তাঁকে ডাকছে কেন?

প্রথমে মজা করেই বললাম, ‘একটু আগে এক অচেনা ‘পণ্ডিত’ যে ভুলটা করলেন, তুমিও তাই করলে! কেন সব বাদ দিয়ে সামিহা আইয়ুবকেই এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে, তাঁর এই প্রশ্নের মতোই তোমার বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসা মানে সামিহা আইয়ুবকে এত দেরিতে কেন? দুই প্রশ্নের একই উত্তর। কোনওটার পিছনেই আমার ভূমিকা পালনের যোগ্যতা নেই। প্রশ্নগুলো আমায় কেন?’

তবে হাসি ঠাট্টা শেষ করে যে কথাগুলো সে দিন উঠে এসেছিল তার সংক্ষেপিত বিবরণীর সঙ্গে এ বছরের বিশ্ব নাট্য দিবস প্রসঙ্গের নিবিড় আত্মীয়তা।

প্রথমত, আরবিভাষী দেশগুলোর মধ্যে মিশরই নাট্যসংস্কৃতিতে সব চাইতে বরাবরই এগিয়ে। প্রায় ১১৩ বছর আগে মানে ১৯১০-এ যখন মলিয়ের-এর ‘তার্ত্যুফ’ আর বার্নার্ড শ-এর ‘সিজার ও ক্লিওপেট্রা’ মঞ্চস্থ হয়, তখনই পুরনো সব অচলায়তন ভাঙার পালা শুরু মিশরের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। কায়রোর হায়ার ইনস্টিটিউট অফ ড্রামাটিক আর্টস থেকে স্নাতক হয়ে থিয়েটারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সামিহা আইয়ুব মেধায়, সৌন্দর্যে, অক্লান্ত চর্চায় ১৭০টি নাটকে বিচিত্র সব চরিত্রে আশ্চর্য অভিনয়দক্ষতায় প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দুনিয়াজুড়ে তিনি অভিনয়গুণে এমন পরিচিতি পেয়ে যান যে, এই ২০২৩-এ কেন, সত্যিই অনেক আগেই ইউনেস্কোর নিয়ন্ত্রণাধীন আইটিআই তাঁকে বাণীদাতার সম্মান দিতে পারত। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, ২০০৭-এ শারজার যে সুলতানকে এই বাণীদাতার সম্মান জানানো হয়, তাঁর নাম বা কাজ নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল। ১৫ বছর পরে আজ তিনি কোথায়? তাঁর সম্বন্ধে অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে বাণীদাতার সম্মান পাওয়ার অভিযোগ সত্যিই বলে মনে হয় অনেকের কাছেই। সেই সূত্রেই ৯১ বছরে পৌঁছে সামিহাকে এই সম্মান দেওয়াকে আন্তর্জাতিক থিয়েটারের চর্চাকারীদের অনেকেই বিলম্বিত বোধোদয় বলছেন। আর যে ফিল্মটিতে সামিহার অভিনয়ের জন্য ওই পণ্ডিতমশাই ভ্রূকুঞ্চন করছিলেন, ১৯৭১-এ তৈরি সেই ফিল্মটি দেখলে বা বুঝলে হয়তো এই ভ্রূকুঞ্চনের সুযোগ পেতেন না তিনি।

৮ মার্চ ১৯৩২-এ সামিহার জন্ম বৃহত্তর কায়রোতে। মাত্র ছয় বছর বয়স থেকে তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু। এই ৯১-তেও সামিহার অভিনয় জগৎ নিয়ে অবসাদহীন আগ্রহ। গামাল আব্দুল নাসের থেকে শুরু করে মিশরের প্রায় সব রাষ্ট্রপ্রধানই সামিহাকে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে গেছেন। নাসেরের প্রশাসন কালে অভিনয়ে যে সেন্সর প্রথা চালু হয়েছিল তার জন্য অভিনেতা ও নির্দেশক সামিহা আইয়ুবকে বিশেষ কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়নি। নেহেরুবান্ধব নাসের-এর ক্ষেত্রে যা সত্যি; নেহরুকন্যার জরুরি অবস্থাকালে এ দেশে থিয়েটারের ক্ষেত্রে এমন ব্যতিক্রমী ঘটনা বিরল বলা যেতে পারে।

এ বছরের দীর্ঘ ভাষণের কয়েকটি অসাধারণ মন্তব্য স্মরণ করে প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

‘স্থিতাবস্থাকে চূর্ণ করা সমকালীনতা আমার মতো অভিনয় শিল্পীর অস্তিত্বের প্রতিটি তন্তুর উপর এখন অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।... এক ভীষণ অস্থায়িত্বের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে আমাদের যাবতীয় বস্তুবাদী যাপনের পাশাপাশি আত্মার শান্তির জগতেও নিত্য বিপন্নতা।... বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি আমাদের সমস্ত সীমানা ও সীমান্ত ভেঙে দিয়ে দুনিয়াটাকে এক ছোট্ট গ্রামে রূপ দেওয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে চললেও আসলে আমাদের ভৌগোলিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যাপনের জটিলতা পৃথিবীটাকে করে তুলছে পরস্পরবিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জ, কিংবা কুয়াশাচ্ছন্ন জলপথে ভাসমান দিশাহীন জাহাজ। যে জাহাজে কোনও ক্যাপ্টেন নেই, তবু চলতে হচ্ছে এই আতঙ্কমলিন আশা নিয়ে যে, একটা সময়ে নিরাপদ বন্দরের খোঁজ পাওয়া যাবে।... আজকের মতো দুনিয়ার মানুষ (ভার্চুয়ালি) এত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যেমন ছিল না, তেমনই আমাদের মতো এত বেসুরো এত সংহতিহীন প্রতিবেশও ছিল না।

এই ধূসর অবসন্ন অধুনায় মনে পড়ছে মহান নাট্য শিক্ষক কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কির চিরকালীন সত্য উচ্চারণকে— ‘কাদা পায়ে নিয়ে থিয়েটার করতে এসো না, যা কিছু নোংরা ধুলো ও জঞ্জাল তা দরজার বাইরে রেখে এসো। ছোটখাটো দুশ্চিন্তা, ঝগড়াঝাটি দিনযাপনের যত রকম পাওয়া-না-পাওয়া হিসেব-নিকেশ— সব কিছু থিয়েটারের দরজার বাইরে ফেলে রেখে এক শুদ্ধ সমবেত প্রয়াসে হাত মেলাতে গলা মেলাতে এগিয়ে এসো।’

উইকিপিডিয়া

প্রতি সম্পাদক

সৈয়দ আসিফ

চাকরির অভাব, বিপন্ন জনসাধারণ

দেশে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে বলে কেন্দ্র যতই দাবি করুক না কেন, বাস্তব চিত্র কিন্তু তা নয়। এই প্রচার যে সর্বৈব মিথ্যা, তা প্রমাণ করেছে সরকারের দেওয়া তথ্যই। সম্প্রতি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও) তাদের নতুন সদস্য সংখ্যার তথ্য প্রকাশ করেছে। ওই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই ডিসেম্বরের তুলনায় নতুন নিয়োগে সদস্য সংখ্যা কমেছে ৭.৫%। ডিসেম্বরে যা ছিল ৮ লক্ষ ৪০ হাজার, জানুয়ারিতে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৩২ জন। এবং গত ২০ মাসের মধ্যে সর্বাধিক নিয়োগ কমেছে এই জানুয়ারি মাসেই।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা আরও কাহিল। অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রকৃত তথ্য জানা নেই। সেখানে নতুন কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, পুরোনো চাকরি টিকিয়ে রাখাই কঠিন কাজ। সব কিছুই মালিকের ইচ্ছাধীন। চাকরির কোনও স্থিরতা নেই। কোভিড পরবর্তীতে সারা দেশে অসংগঠিত ক্ষেত্রে বহু মানুষ কাজ হারিয়েছে। তিন বছর পর আজও সবাই পুরোনো কাজ ফিরে পায়নি। যারা পেয়েছে, তাও কম বেতনে।

বেসরকারি ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থায় চলছে লাগাতার ছাঁটাই ও ক্লোজার। ভারতের শাখা অফিসগুলিতেও তার প্রভাব প্রকট। ফেসবুকের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মেটা প্ল্যাটফর্ম ছ’মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করেছে। এর আগে গত বছর নভেম্বরে তারা ছাঁটাই করেছিল ১১ হাজার কর্মীকে। এ ছাড়া আমেরিকায় অ্যামাজন এই মার্চে ১০ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করার কথা ঘোষণা করেছে। বাদ যায়নি ভারতের অ্যামাজন শাখাও। সেখানেও চলছে কর্মী সংকোচন। পাশাপাশি মাইক্রোসফট, মর্গান স্ট্যানলি, গোল্ডম্যান স্যাকস-এর মতো বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা, ব্যাঙ্ক ও বিমা সহ একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি বিভাগে চলছে ব্যাপক ছাঁটাই।

এক দিকে কোনও ক্ষেত্রেই নতুন নিয়োগ তেমন নেই, অথচ ছাঁটাই হচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষের আয় কমছে, বেকারত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য, এর আগে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৩০%। তথ্য অনুযায়ী, দেশের শহরাঞ্চলের বেকারত্বের হার জানুয়ারিতে ৮.৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং গ্রামীণ অঞ্চলে বেকারত্বের হার ৬.৪৩%।

কুমার শেখর সেনগুপ্ত, কোন্নগর, হুগলি